শতবর্ষে জন বার্ডিন

অল্প কথায় বার্ডিনের জীবন। অল্প কথায় বার্ডিনের গবেষণা। প্রযুক্তির দিকটা তুলনায় বড় করে উল্লিখিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

দেবতোষ গুহ

জন বার্ডিন — ছোট্টো একটি নাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমরা ক'জন এই নামটির সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত? ভাবলে অবাক হতে হয়, এই মানুষটির বিজ্ঞান সাধনা ও আবিষ্কারই আজকের ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিকে এই জায়গায় পৌঁছতে সাহায্য করেছে। আমাদের চারিদিকে দৈনন্দিন যা-ই দেখি না কেন, প্রায় সবই তাঁর আবিষ্কারের ফসল। হাত বাড়াতেও হবে না, পকেটের ভেতরে রাখা ছোট ওই যন্ত্রটি বার্ডিনকে বাদ দিয়ে কল্পনাও করা যায় না।

এছাড়াও, বার্ডিনই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি পদার্থবিদ্যায় দু'-দু'বার নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত। প্রথমবার 1956-তে সেমিকন্ডাক্টর ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের জন্য এবং এর ঠিক 16 বছর পর আবার দ্বিতীয়বার 1972-এ সুপারকন্ডাক্টিভিটির সঠিক ব্যাখ্যাটি দেওয়ার জন্য। এককথায়, আধুনিক পৃথিবীর রূপকার বলতে যদি ক'জন বিজ্ঞানীকে বেছে নেওয়া হয়, জন বার্ডিন অবশ্যই তাঁদের অন্যতম। 2008 এমনই এক জন মানুষের জন্ম শতবর্ষের বছর। বলা বাহুল্য বার্ডিনের জন্ম 1908 সালে। কিন্তু কেমন ছিল তাঁর শৈশব ও ছাত্রজীবন এবং কতটা বর্ণময় ছিল তাঁর গবেষণার জগৎ ও সাফল্য — শতবর্ষের আলোয় তা একবার দেখে নেওয়া যাক।

শৈশব ও প্রথম জীবন

বার্ডিনের জন্ম আমেরিকার ম্যাডিসন শহরে 1908-এর 23শে মে, এক উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে। বাবা ছিলেন চিকিৎসক এবং একই সঙ্গে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এনাটমির অধ্যাপক। বার্ডিন অল্প বয়সেই মাকে হারান, তবে তা তাঁর লেখাপড়ায় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। 1928 সালে তিনি উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি এস ডিগ্রি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হন। পাস করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই ফলিত ভূপদার্থবিদ্যায় সহকারী গবেষক হিসাবে কাজ শুরু করেন। গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। এখানেই অধ্যাপক ভ্যান ব্লেকের কাছে কোয়ান্টাম তত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়। এই শিক্ষা পরবর্তী কালে গবেষণার কাজে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছে। পিএইচ ডি-র কাজে তাঁর সুপারভাইজর ছিলেন অধ্যাপক লিঁয় পিটার। পিটার বছর দুয়েকের মধ্যেই নতুন চাকরি নিয়ে চলে আসেন পিটসবার্গ গালফ রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে। বাধ্য হয়ে বার্ডিনকেও পিটসবার্গে চলে আসতে হয়। এর পরের তিন বছর 1930-1933 বার্ডিন কাজ করেন গ্র্যাভিটেশনাল ও ম্যাগনেটিক সার্ভে নিয়ে। কিন্তু এই কাজ তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। 1933-এ পিটসবার্গ ছেড়ে তিনি চলে আসেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্দেশ্য ছিল ম্যাথেমেটিক্যাল ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনো করা। এখানেই তাঁর হাতেখড়ি হয় সলিড স্টেট ফিজিক্সের অধ্যাপক ই পি উইগনারের কাছে। বিশেষ কিছু পদার্থের ভেতরে তড়িৎকণার চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি তাত্ত্বিক ভাবে ব্যাখ্যা এবং নির্ণয়

করাই সলিড স্টেট ফিজিক্সের মুখ্য বিষয়। বার্ডিন শেষ পর্যন্ত তাঁর পিএইচ ডি থিসিসের শিরোনাম নির্বাচন করেন 'অন দ্য থিওরি অব্ ওয়ার্ক ফাংশান অব্ মেটাল'। 1936 সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পিএইচ ডি ডিগ্রি পান। অবশ্য তার আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বৃত্তি জুটে যায়, সেখানে তাঁর গবেষণার নতুন বিষয় ছিল—কোহিশন অ্যান্ড ইলেকট্রিকাল কন্ডাকশন ইন মেটাল। 1935-1938 দীর্ঘ তিন বছর কাটে এই কাজ নিয়ে। এই গবেষণাই মনে হয় পরবর্তী কালে বার্ডিনকে তাঁর কালজয়ী উদ্ভাবনে সাহায্য করেছিল।

1938-এ হার্ভার্ড ছেড়ে বার্ডিন এসে যোগ দেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক পদে। তিন বছরের মাথায় 1941-এ মিনেসোটা ছেড়ে তিনি চলে এলেন ওয়াশিংটন ডি সি তে, সেখানকার ন্যাভাল অরডনান্স লেবরেটরিতে। মনে হয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কোনো বিশেষ গবেষণার কাজে সাহায্যের প্রয়োজনেই তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। বার্ডিন তত দিনে বিবাহিত। স্ত্রী জেন এবং তাঁদের তিনটি সন্তান। 1945-এ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বদলাতে শুরু করল। বার্ডিনের জীবনেও এল নতুন বাঁক।

প্রথম ট্রানজিস্টার : প্রথম নোবেল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজনকে অনেকটা উসকে দিল। নিউজার্সির বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিও সলিড স্টেট গবেষণার জন্য একটি বেশ বড়সড় প্রকল্পে হাত দিল। প্রধান নিযুক্ত হলেন দুজন বিজ্ঞানী—মরগান ও শক্লে। এই প্রকল্পেরই একটি শাখা ছিল 'সেমিকনডাক্টর', আর তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ছিলেন উইলিয়ম শক্লে নিজে। শক্লে ছিলেন মূলত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। সে সময় সেমিকনডাক্টর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেমিকনডাক্টরকে কাজে লাগিয়ে ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ছোট্ট ট্রায়োড তৈরি করা যা দিয়ে সহজেই ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার বানিয়ে ফেলা যায়। আসলে সে সময় ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহারে নানারকম অসুবিধা দেখা যাচ্ছিল যেমন, আকারে বড়, ওজনে বেশ ভারী, তার ওপর কাজ শুরুর আগে অনেকটা সময় নেয় ধাতব ইলেকট্রোডগুলো গরম হতে। তাই শক্লে কাজ শুরু করতে আর দেরি করলেন না। তাঁর দলে চাই নতুন দক্ষ গবেষক। নিয়ে এলেন দুই পদার্থবিদকে। বেল ল্যাবরেটরিরই মধ্যে থেকে ওয়াল্টার ব্র্যাটেনকে, আর ন্যাভাল ল্যাবরেটরি থেকে জন বার্ডিনকে। প্রথম জন দক্ষ হাতেকলমে যন্ত্র তৈরিতে, আর দ্বিতীয় জন ভালো বোঝেন পদার্থের ভেতরে তড়িৎকণার সূক্ষ্ম গতিবিধি।

বার্ডিন সপরিবারে চলে এলেন মারি হিল-এ, এখানেই তাঁর কাজের জায়গা বেল ল্যাবরেটরি। ব্র্যাটেনের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। ক্রমে এই দুই বিজ্ঞান সাধকের বন্ধুত্ব ল্যাবরেটরি ছাড়িয়ে খেলার মাঠ অবধি এসে পৌঁছল।

1945-এর গোড়ায় শক্লে তাঁর প্রথম সেমিকনডাক্টর অ্যামপ্লিফায়ার বানাবার পরিকল্পনা করে ফেলেন। অ্যামপ্লিফায়ার বানাতে গেলে যা প্রথম প্রয়োজন তা হল একটি ডিভাইসের মধ্যে স্পেসচার্জের সঠিক নিয়ন্ত্রণ যা হবে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক প্রথায়, ভোল্টেজ বা কারেন্টের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এই জিনিসটিই শক্লে করতে চেয়েছিলেন কনডেন্সরের মধ্যে যেভাবে চার্জ বা তড়িৎকণা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে। নাম দিয়েছিলেন 'ফিল্ড এফেক্ট'। তাঁর প্রথম যন্ত্রটা ছিল গায়ে পাতলা সিলিকনের আস্তরণ জড়ানো একটা ধাতব সিলিন্ডার, আর তার কাছে রাখা একটা ধাতব পাত। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্র বুঝতে পারবে শক্লে আসলে কী করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই যন্ত্রটা একেবারেই কাজ করেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ডাক পড়ল বার্ডিন ও ব্র্যাটেনের। দুজনে লেগে পড়লেন সমাধানের কাজে। বার্ডিন তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে যন্ত্রটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মাথায় এল নতুন এক ভাবনা। ব্র্যাটেনকে ডেকে নতুন একটা পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। ব্র্যাটেনও সেই মত অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট তৈরি করে ফেললেন, কিন্তু কোনো কাজই হল না। ব্র্যাটেইন চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। অনেকদিন অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শেষে হঠাৎ একদিন ব্র্যাটেন তাঁর অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটটাকে জলে চুবিয়ে দিলেন। ম্যাজিকের মতো কাজ হল, অ্যামপ্লিফায়ার সাড়া দিচ্ছে। ব্র্যাটেন ও তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানী রবার্ট গিবনে বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সেটা ছিল 1947-এর 17 নভেম্বর।

জলে ভেজা অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের এরকম অদ্ভুত ব্যবহার বার্ডিনকে নতুন করে ভাবিয়ে তুললো। আরও চারদিন কাটল। 21শে নভেম্বর বার্ডিন বললেন, সিলিকন টুকরোর ভেতর ধাতুবিন্দু তৈরি করে তার চারধারে পরিস্রুত জল রেখে দিতে। সেই মতো কাজ শুরু করে দিলেন ব্র্যাটেন। উদ্‌গ্রীব দুজনেই, দেখা গেল অ্যামপ্লিফায়ার কাজ করছে, তবে বিবর্ধনের মাত্রা বড্ড কম। কেন এমন হচ্ছে? বার্ডিন অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। ইলেকট্রনগুলো তবে কি সেমিকনডাক্টর ক্রিস্টালের ভেতর যে ভাবে কাজ করে, ধাতুর গায়ে সেভাবে কাজ করে না? এই তাত্ত্বিক অনুমানের ভিত্তিতেই বার্ডিন ঠিক করলেন, সিলিকনের পরিবর্তে অন্য একটি সেমিকনডাক্টর জার্মেনিয়ম ব্যবহার করবেন। ব্র্যাটেন সেই মতো নতুন সার্কিট বানিয়ে ফেললেন। অবাক কাণ্ড! একলাফে তড়িৎপ্রবাহ প্রায় 330 গুণ বেড়ে গেল। বার্ডিন ঠিকই অনুমান করেছিলেন, ইলেকট্রন একা নয়, তড়িৎ প্রবাহে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে 'হোল', অর্থাৎ ইলেকট্রন-মুক্ত তুলনায় বড় পজিটিভ আধানযুক্ত একটি তড়িৎকণা।

সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়, এই অ্যামপ্লিফায়ার সব কম্পাঙ্কে কাজ করতে পারে না। যেমন টেলিফোনের বেলায় কত রকমের কম্পাঙ্ক সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। বার্ডিন-ব্র্যাটেন জুটি আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। ব্যবহার করলেন সোনা। গোল্ড পয়েন্ট কন্টাক্ট ব্যবহারই অবশেষে সাফল্য এনে দিল। কোনো কম্পাঙ্কই আর বাধা হয়ে দাঁড়াল না। বার্ডিন ও ব্র্যাটেনের হাতেই তৈরি হল পৃথিবীর প্রথম 'পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট ট্রানজিস্টার'।

এই আবিষ্কারের কথা আরো এক সপ্তাহ গোপন রইল। শক্লে এই সংবাদ পাওয়ার পর বার্ডিন ও ব্র্যাটেনকে ডেকে তাঁদের গবেষণা দলের সবার সামনে পরীক্ষাটা করে দেখাতে বললেন। 23শে ডিসেম্বর, ক'দিন বাদেই খ্রিস্টমাস, উৎসবের আবহাওয়া, বার্ডিন ও ব্র্যাটেন দাঁড়িয়ে, সামনে

তাঁদের ছোট্ট যন্ত্রটা। ছোট এক টুকরো জার্মেনিয়মের ওপর এক মিলিমিটারেরও কম দূরত্বে রাখা পাশাপাশি দুটো গোল্ড পয়েন্ট কন্টাক্ট — সর্বসমক্ষে স্বীকৃত পৃথিবীর প্রথম সলিড স্টেট অ্যামপ্লিফায়ার।

নতুন আবিষ্কারের ওপর দেড় পৃষ্ঠার ছোট্ট একটা পেপার লিখে বার্ডিন ও ব্র্যাটেন পাঠিয়ে দিলেন 'ফিজিক্যাল রিভিউ' পত্রিকায়। 1948 এর জুলাই সংখ্যায় তা ছাপা হল, শিরোনাম ছিল 'দ্য ট্রান্সজিস্টর, এ সেমিকনডাক্টর ট্রায়োড'। এতে ছিল দুটি মাত্র চিত্র ও ছোট একটি সমীকরণ, আর শক্‌লের নাম শুধু উল্লেখ করা হয়েছে প্রবন্ধের একেবারে শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে। এই গবেষণাপত্রই কিন্তু দুই লেখককে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল এরও প্রায় আট বছর পর। শক্‌লে প্রথম ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের কৃতিত্ব হারালেন, অথচ সেমিকনডাক্টর অ্যামপ্লিফায়ার তাঁরই প্রথম পরিকল্পনা। এই জিনিসটার গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রয়োগ বোধহয় শক্‌লেই সবার প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে এটা ছিল শক্‌লের কাছে একটা বড় আঘাত। মান অপমানের সংঘাতে শক্‌লের সঙ্গে বার্ডিন-ব্র্যাটেন জুটির সম্পর্ক নষ্ট হতে লাগল।

বার্ডিন বেল ল্যাবরেটরি ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 1951-তে বার্ষিক দশ হাজার মার্কিন ডলার বেতনে যোগ দিলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসে তিনি অনেক স্বাধীন ও স্বস্তি বোধ করলেন। তিনি ছিলেন মূলত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। পদার্থের শূন্য রোধ অর্থাৎ জিরো রেসিস্টান্স কীভাবে ঘটে সেই রহস্য ভেদ করার দিকে তাঁর নজর গেল। গবেষণা অধ্যাপনা এই নিয়েই বার্ডিনের দিন কাটছিল। হঠাৎ 1956-র 1লা নভেম্বর সকালে ঘটনাটা ঘটল। বার্ডিন রান্নাঘরে জলখাবার তৈরি করছিলেন, রেডিওটা বাজছিল। তাঁর কানে গেল সংবাদ পড়তে পড়তে হঠাৎ সংবাদ-পাঠক ঘোষণা করছেন —এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তিন মার্কিন বিজ্ঞানীকে, তাঁরা হলেন জন বার্ডিন, ওয়াল্টার ব্র্যাটেন এবং উইলিয়ম শক্‌লে। বার্ডিন আনন্দে ছুটে গেলেন পাশের ঘরে, জীবনসঙ্গিনীকেই প্রথম জানালেন তাঁর জীবনের এত বড় সংবাদটা!

বার্ডিন-ব্র্যাটেনের সঙ্গে এখানে শক্‌লের নাম এল কী করে? বিষয়টা এখুনি বলে নেওয়া ভাল। আমরা এতক্ষণে জেনে গিয়েছি যে বার্ডিন-ব্র্যাটেনকে শক্‌লেই নিয়ে এসেছিলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে। গবেষণার মূল বিষয়টি তিনিই এঁদের দুজনকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ সেই আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত না হতে পেরে তা শক্‌লের মনে ক্ষোভের চেহারা নিল। ক্ষোভ থেকে জন্ম নিল জেদ — নতুন আবিষ্কারের জেদ। বার্ডিন-ব্র্যাটেনের পয়েন্ট কন্টাক্ট ট্রানজিস্টারকে তিনি কল্পনা করলেন ভিন্ন এক রূপে—তিনটি সেমিকনডাক্টর খণ্ডকে পর পর সাজিয়ে। এই কাজটিকে পুরো ভাবতে এবং কাগজে কলমে ছকে ফেলতে তাঁর সময় লেগেছিল চার সপ্তাহের মতো, আর এই কাজটা শক্‌লে করেছিলেন শিকাগো শহরের একটি হোটেলের ঘরে বসে। এর পর টানা দুবছরের চেষ্টায় তৈরি হল শক্‌লের নতুন জাংশন ট্রানজিস্টার, যা আগের পয়েন্ট কন্টাক্ট ট্রানজিস্টারের তুলনায় অনেক বেশি সুগঠিত, বাণিজ্যিক ভাবে তৈরির দিক থেকেও অনেক বেশি উপযোগী।

ভেঙে যাওয়া দলের তিন সহকর্মী-বিজ্ঞানী বার্ডিন, ব্র্যাটেন ও শক্‌লে আবার বহু দিন বাদে এক সাথে হলেন 1956-এর 10ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়, স্টকহোমে নোবেল পুরস্কারের অনুষ্ঠানে। বার্ডিন নোবেল অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁর তিন ছেলেমেয়ের একজনকে সঙ্গে নিয়ে। স্ত্রীকেও সাথে আনেন নি অন্য দুই সন্তানের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বলে। সুইডেনের রাজা গুস্তভ এজন্য বার্ডিনকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন—'এমন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে আসা আপনার উচিত ছিল'। সলজ্জ বিনয়ে বার্ডিন রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—'পরের বার নিশ্চয়ই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আসব'। রাজা গুস্তভ এই উত্তর শুনে কি ভেবেছিলেন জানি না, তবে বার্ডিন তাঁর কথা রেখেছিলেন। এই 'পরের বার'টি বার্ডিনের জীবনে এসেছিল 1972-এ। আবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল!

দ্বিতীয় নোবেল

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে কাজের পরিবেশ বার্ডিন উপভোগ করছিলেন। চরম শূন্য বা তার কাছাকাছি তাপমাত্রায় ধাতু ও ধাতুমৌলের শূন্যরোধ বা অতিপরিবাহিতা তখন এক পরীক্ষিত সত্য এবং পদার্থের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ সন্ধানে বিজ্ঞানী মহল তৎপর। বার্ডিন তাঁর নোবেল লেকচারে বলেছিলেন এই সমস্যা তাঁর মাথায় ঘুরছে 1940 সাল থেকে। তাঁর কথা ও জীবন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় আসলে সেমিকনডাক্টর বা ট্রানজিস্টার নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল মূলত শক্‌লের পরিকল্পনা অনুযায়ী।

লিও কুপার পিএইচ ডি-র কাজ শেষ করে বার্ডিনের সঙ্গে যোগ দিলেন পোস্টডক্টোরাল ফেলো হিসাবে। বার্ডিনের কাছে কাজ করছিল তাঁর আর এক গ্র্যাজুয়েট ছাত্র (আমরা এখানে বলি পোস্টগ্র্যাজুয়েট) বব্ শেরিফার। গুরু তাঁর দুই সহযোগী ছাত্রকে উদ্বুদ্ধ করলেন খুঁজে বার করতে পদার্থের এই শূন্যরোধ বা অতিপরিবাহিতার কারণ কী? মণি-কাঞ্চন যোগ নতুন আলোর সন্ধান দিল। সুপারকন্ডাক্টর আবিষ্কারের 49 বছর পর 1957-তে কুপার ও শেরিফারকে সঙ্গে নিয়ে বার্ডিন-এর সঠিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁদের সেই তত্ত্ব পরবর্তীকালে 'বি সি এস' (বার্ডিন-কুপার-শেরিফার) থিওরি নামে খ্যাত। এই তত্ত্বই 1972 সালে তার তিন প্রবক্তাকে এনে দিল পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার। বার্ডিন দ্বিতীয় বারের জন্য সম্মানিত হলেন নোবেল পুরস্কারে।

বার্ডিনের দু-দুটো উদ্ভাবনই পদার্থবিজ্ঞানের দুটি শাখায় দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। তবে তাঁর প্রথম আবিষ্কারের কাছে আজকের এই আধুনিক সভ্যতা চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে। টেলিফোন থেকে কম্পিউটার—কোনোটিই তাঁর কাজকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। আমাদের সেলফোনে মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় সক্রিয় হয়ে ওঠে যে জিনিসটি তা হল ট্রানজিস্টার। তারই জনকের শতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই রচনা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। ●

❑ *অধ্যাপক, রেডিয়োফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*
ফোন: (0) 9231353055